

ওয়ার অ্যান্ড পিস ইন ইসলাম

ড. তারিক রমাদান
ভাষান্তর : রোকন উদ্দিন খান



গার্ডিয়ান

পাবলিকেশনস

ভূমিকা

ইসলাম কি সহিংসতার ধর্ম? সহিংসতা সম্পর্কে ইসলামের বক্তব্য কী? ইসলাম কি সহিংসতার অনুমোদন, উৎসাহ বা নির্দেশ দেয়? বিশ্ব গণমাধ্যমে অবিরতভাবে ইসলামের ‘জিহাদ’ পরিভাষাটি ইসলাম ও মুসলিমদের সহিংসতার প্রতিশব্দ হিসেবে উপস্থাপিত হয়ে আসছে। মহামারি আকারে ছড়িয়ে পড়া ধর্মান্ধতা ও মৌলবাদের ‘পবিত্র যুদ্ধ’ সম্পর্কে প্রচুর নেতিবাচক লেখালিখি হচ্ছে, ‘জিহাদের’ এই ভয়ানক রূপ যতদিন প্রচারিত হতে থাকবে, ততদিন অনেকের কাছে ইসলাম একটি আতঙ্কের ধর্ম হিসেবে উপস্থিত হতেই থাকবে।

বিষয়টি এমন দাঁড়িয়েছে—কেউ যখন সহিংসতার কথা বলে, তখন সে যেন জিহাদের কথাই বলে। কাজেই জিহাদকে সঠিকভাবে সংজ্ঞায়িত এবং জিহাদের বিভিন্ন দিককে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তুলে ধরা একটি জরুরি বিষয়ে পরিণত হয়েছে। কীভাবে ইসলামের একটি মৌলিক প্রত্যয় অন্ধকারাচ্ছন্ন চেহারা নিয়ে আমাদের সামনে হাজির হলো? কী সেই কারণ, যার জন্য ইসলামের এমন গুরুত্বপূর্ণ একটি অনুষঙ্গ ইসলামের সবচেয়ে খারাপ দিক হিসেবে উপস্থিত হলো? যদিও ইতিহাসের সাম্প্রতিক ঘটনাপ্রবাহের ভেতর এর উত্তর রয়েছে, তবুও একটু তলিয়ে দেখলে পাওয়া যাবে—এর শেকড় রয়েছে আরও পেছনে; মধ্যযুগে।

একেবারে শুরু থেকেই ইসলামের অনেকগুলো প্রত্যয়কে বোঝার চেষ্টা করা হতো অন্য কিছুসহ সাথে তুলনা করে। ক্রুসেডের সময় যখন মুসলিম শাসন ক্রমেই দুনিয়ার বুকে ছড়িয়ে পড়ছিল, তখন খ্রিষ্টানদের ‘হলি ক্রুসেড’-এর বিপরীতে মুসলিমদের জিহাদকে ‘হলি ওয়ার’ হিসেবে বিবেচনা করা শুরু হলো। পশ্চিমা বিশ্ব তাদের পবিত্র যুদ্ধের প্রাথমিক অধ্যায়কে অতিক্রম করতে সক্ষম হলেও মুসলিম বিশ্ব পিছিয়েই থাকল। আর আমরা অবিরতভাবে দেখতে থাকলাম—আজও দুনিয়ার বিভিন্ন প্রান্তের বিভিন্ন মুসলিম গ্রুপ, আন্দোলন, রাজনৈতিক দল এবং সরকার সাধারণ মুসলিমদের জিহাদ ও সশস্ত্র যুদ্ধের দিকে আহ্বান জানিয়ে চলেছে।

ইসলাম কি আবার দুনিয়ার নেতৃত্বের আসনে বসবে? এটি একটি বৈধ প্রশ্ন, কিন্তু এ প্রশ্ন কিছু ভুল বোঝাবুঝির উদ্রেক করে। এই ভুল নিরসনের লক্ষ্যে আমাদের অবশ্যই ‘জিহাদ’ ধারণাটির মূল উৎসের কাছে ফিরে যেতে হবে এবং এর সঠিক ব্যাখ্যা জেনে নিতে হবে। ‘জিহাদ’ ধারণাটির সঠিক বোঝাপড়াকে আয়ত্ত করতে পারলে দেখা যাবে, ইসলাম সম্ভাব্য সংঘাতকে অস্বীকার করে না; হোক সেটা ধর্মীয় কিংবা যুদ্ধসংক্রান্ত। তবে জিহাদের প্রথম ও প্রধান দিক হলো— আত্মরক্ষামূলক প্রতিরোধ (প্রতিপক্ষের আক্রমণ ও নিপীড়নকে রুখে দেওয়ার লক্ষ্যে) এবং সকল পরিস্থিতিতে এই প্রতিরোধযুদ্ধের ক্ষেত্রে অনেকগুলো শর্ত ও বিধিবিধান আরোপিত হয়েছে। দুনিয়াজুড়ে ইসলাম যে সংগ্রামের আমন্ত্রণ জানায়, তা মূলত সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা, শিক্ষার অধিকার ও দরিদ্রতা থেকে মুক্তির সংগ্রাম। এটি হলো মানুষের বাড়াবাড়ি ও শোষণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ। যখন মানুষ তার দায়িত্ব ভুলে গিয়ে নিপীড়ন ও শোষণের পথ বেছে নেয় এবং দুর্বল ও অসহায় মানুষের অধিকার ছিনিয়ে নেয়, তখন মুসলিমদের সামনে যুদ্ধ অর্থে জিহাদ ছাড়া আর বিকল্প কোনো পথ থাকে না।

তারিক রমাদান

সূচিপত্র

সহিংসতার বীজ	১১
কোন ‘সহিংসতা’	১২
সহিংস মুসলিম— একটি বাহুল্য কথা	১২
ইসলামের প্রাণকেন্দ্রেই রয়েছে শান্তি	১৭
দুটি পরিষ্কার পথ	২০
প্রাকৃতিক ও মানবীয় টানাপোড়েন	২৩
সংঘাতের বাস্তবতা	২৬
বৈচিত্র্য আল্লাহরই অভিলাষ	২৬
শক্তির ভারসাম্য রক্ষা	২৯
বহুত্বকে নিয়ন্ত্রণ	৩০
সশস্ত্র প্রতিরোধ	৩২
প্রতিরোধের পাঁচ শর্ত	৩৬
১. প্রতিরোধব্যবস্থা হিসেবে যুদ্ধ	৩৮
২. ধর্মের স্বাধীনতা	৪৩
৩. মত প্রকাশের স্বাধীনতা	৪৫
৪. চুক্তির প্রতি শ্রদ্ধা	৫০
৫. একতা ও সংহতির দায়িত্ব	৫১

পাঁচ মূলনীতির শিক্ষা	৫৩
ন্যায়বিচারের অধিকার	৫৩
কেবল শান্তিই কাম্য	৫৪
যুদ্ধের ভেতরে	৫৭
যুদ্ধসংক্রান্ত কুরআনের অন্যান্য বক্তব্য	৬০
সন্ত্রাসবাদ	৬১
জীবন উৎসর্গ করা	৬৩
সামাজিক জিহাদ	৬৬
জিহাদের বহুমুখী কার্যক্রম	৬৬
আধুনিক যুগের চ্যালেঞ্জ	৬৮
উপসংহার	৭১

সহিংসতার বীজ

যুদ্ধ ও শান্তিসংক্রান্ত ইস্যুগুলো নিয়ে আলোচনার সময় কেবল কোনো সুনির্দিষ্ট ঘটনা অথবা পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতিতে আমলে নিলে চলে না। উদাহরণস্বরূপ, কেউ যদি ইসলামের উৎস থেকে প্রাপ্ত তত্ত্ব ও নির্দেশনাগুলো না জেনেই কোনো সামাজিক বা রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে যুদ্ধ ও শান্তির বিষয়টিকে বুঝতে চায়, তাহলে তা তাকে খুব সীমিত জ্ঞান উপহার দেবে। অবশ্যই সব মুসলিমকে এমনকী অমুসলিমকেও জানতে হবে, এই স্পর্শকাতর ইস্যু সম্পর্কে স্বয়ং ইসলামের বক্তব্য কী।

যুদ্ধ সম্পর্কে ইসলামের অবস্থানকে বুঝতে হলে মানুষ ও জগৎ সম্পর্কে ইসলামের অবস্থান বুঝতে হবে। কেননা, এ দুটি বোঝাপড়া পরস্পরের সাথে সম্পর্কযুক্ত। কেউ যদি মনে করে যে, মানুষ হলো ফেরেশতার মতো, তাহলে তার যুদ্ধ সম্পর্কিত আলোচনায় অংশ নেওয়া ঠিক হবে না। অন্যদিকে কেউ যদি মানুষকে কেবল পশু হিসেবে বিবেচনা করে, তাহলে সে যুদ্ধ ছাড়া আর কিছুই ভাবতে পারে না। অতএব, কেউ যদি মানুষকে এভাবে বিবেচনা করে—মানুষ একদিকে পশুত্ব দ্বারা পরিচালিত হতে পারে, আবার অন্যদিকে সে আধ্যাত্মিকতার চূড়ান্ত স্তরে উন্নীত হতে পারে, তখন আত্মনিয়ন্ত্রণ, শান্তি-ব্যবস্থাপনা ও যুদ্ধসংক্রান্ত বিধিমালায় প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। এই ধারণা থেকেই মানবজাতির সামনে কুরআন ও হাদিসের বক্তব্য উপস্থাপিত হয়েছে।

কোন ‘সহিংসতা’

পশ্চিমা দেশগুলোতে বসবাসরত এমন একজন মুসলিমও নেই, যে যুদ্ধ ইস্যু কিংবা আরও বৃহৎ দৃষ্টিতে বলতে গেলে বৈশ্বিক পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বিগ্ন নয়। বর্তমান বিশ্বব্যবস্থা নিশ্চিতভাবেই ভীতিকর (এই গ্রন্থটি প্রণীত হয়েছে ২০১৭ সালে—অনুবাদক)। আজ প্রতিদিন ৪০ হাজার মানুষ ক্ষুধার জ্বালায় মারা যাচ্ছে, যাদের মধ্যে ১০ হাজার মানুষ মারা যাচ্ছে ঋণের জালে আবদ্ধ হয়ে। শক্তিশালী প্রযুক্তির উদ্ভাবন এবং ছড়িয়ে পড়া বিশ্বায়ন সত্ত্বেও গত দুই শতাব্দীতে মানুষের মৃত্যুসংখ্যা মোটেও কমেনি। হিসাবটা সহজ। এখন প্রতি দুই দিনে দুনিয়াজুড়ে যত মানুষ মারা যাচ্ছে, সে সংখ্যাটি হিরোশিমা^১ শহরে পারমাণবিক বোমা নিক্ষেপের ফলে মারা যাওয়া মানুষের সমান। বাস্তবতা হলো—এই সহিংসতা কোনো অস্ত্র বা বোমার মাধ্যমে ঘটছে না।

^১. হিরোশিমা হলো জাপানের একটি শহর। ১৯৪৫ সালের ৬ আগস্ট আমেরিকানরা হিরোশিমাতে পারমাণবিক বোমা নিক্ষেপ করে, যার আঘাতে ১ লক্ষ ৪০ হাজার মানুষ নিহত হয়।

সহিংস মুসলিম—একটি বাহুল্য কথা

শোষণ, গৃহবিবাদ ও দরিদ্রতা বর্তমান দুনিয়ার প্রতিদিনকার বাস্তবতা। কিন্তু এগুলোকে যুদ্ধের আওতায় ফেলা হয় না, কেবল অস্ত্রকেই যুদ্ধের একমাত্র হাতিয়ার হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এই দৃষ্টিতে পশ্চিমারা ইসলামি বিশ্বকে ‘সহিংস’ হিসেবে বিবেচনা করে।

স্যামুয়েল হান্টিংটন তার বিখ্যাত ‘সভ্যতার দ্বন্দ্ব’^২ (ক্ল্যাশ অব সিভিলাইজেশন) প্রবন্ধে বলেছেন—‘পশ্চিমা বিশ্বের সাথে সীমান্তবর্তী যে দেশগুলোর সংঘাত রয়েছে, তার সবগুলো ইসলামি সভ্যতার দেশ।’ এটি কেউ অস্বীকার করতে পারবে না, বহু মুসলিম দেশ সশস্ত্র সংঘাতের মধ্যে রয়েছে। সেই সংঘাতের ঘটনাগুলোকে পুঁজি করে অনেকে এটি প্রমাণ করতে চায়—ইসলাম ধর্মটিই সহিংসতার ধর্ম। এভাবে তারা সর্বনাশা একটি উপসংহার টানে, যা সত্যিই দুনিয়ার জন্য সর্বনাশের কারণ হতে চলেছে। সাংবাদিক, গবেষক ও চিন্তাবিদদের বৃহৎ একটা অংশ ইসলামকে সাধারণ মানুষের কাছে প্রকৃতিগতভাবে সহিংসতার ধর্ম হিসেবে উপস্থাপন করে চলেছে।

যে পুরোনো আইডিয়াগুলো মধ্যযুগে প্রাধান্য লাভ করেছিল এবং মনে করা হয়েছিল সেগুলো রদ হয়ে গেছে, আমরা আবারও সেগুলোকে এখানে দেখার চেষ্টা করব। যেমন : একটি আইডিয়া হলো—‘ইসলাম সৈন্যসামন্ত ও যুদ্ধবিগ্রহের মাধ্যমে বিস্তার লাভ করেছে’ অথবা ‘তরবারির জোরে মানুষকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণে বাধ্য করেছে।’

এ প্রসঙ্গে আমরা বিখ্যাত ফরাসি লেখক ও চিন্তাবিদ সাতাব্রিয়ান্ড^৩-এর মতামত স্মরণ করব, যিনি বলেছিলেন—

‘ক্রুসেড শেষ হয়েছে বলে আমাদের কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। কারণ, মুহাম্মাদ ﷺ-এর অনুসারী ও তাঁদের বিধানের বিস্তারকে ঠেকিয়ে দেওয়া গেছে।’

আমরা মনে করি এ আলাপ সেকেলে হয়ে গেছে, তবে “ইসলামভীতির” সেই মানসিকতা আজও পশ্চিমের বহু লোক লালন করে চলেছে।

^২. হান্টিংটন, স্যামুয়েল (১৯২৭-২০০৮) ছিলেন হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটির একজন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী। তিনি ১৯৯৩ সালে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, বিশ্বরাজনীতিতে সভ্যতার দ্বন্দ্ব প্রাধান্য লাভ করবে—যেখানে পশ্চিমা সংস্কৃতির মুখোমুখি দাঁড়াবে মুসলিম বিশ্ব।

^৩. সাতাব্রিয়ান্ড, ফ্রান্সইস রেনে (১৭৬৮-১৮৪৮) ছিলেন একজন ভিসকাউন্ট ও ফরাসি লেখক।

ইসলামের প্রাণকেন্দ্রেই রয়েছে শান্তি

একজন মুসলিম তার ধর্ম সম্পর্কে যা জানে, বোঝে ও অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয়, তা মূলত তাকে গভীর প্রশান্তির সন্ধান দেয়। ‘ইসলাম’ শব্দটি ‘সালামা’ মূল শব্দের চতুর্থ ব্যাকরণিক রূপ। ‘ইসলাম’ও ‘আসলামা’ শব্দ দুটির মানে হলো—হৃদয়ের শান্তিময়তার সাথে আল্লাহর কাছে পূর্ণ আত্মসমর্পণ। আল্লাহ তায়ালা বলেন—

أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ-

‘জেনে রেখ, আল্লাহর স্মরণেই হৃদয় প্রশান্ত হয়।’

সূরা আর-রাদ : ২৮

আল্লাহর ওপর নির্ভরতা ও আল্লাহর কাছে শান্তি কামনার মাধ্যমে মানুষ হৃদয়ের প্রশান্তি লাভ করে। এ কারণে মহানবি মুহাম্মাদ ﷺ দুআ করতেন—‘হে আল্লাহ! আপনি শান্তিময়, আপনার কাছ থেকেই শান্তি আসে এবং আপনার কাছেই শান্তি ফিরে যায়।’ এর চাইতে শান্তির আকাঙ্ক্ষার ঐকতান আর কী হতে পারে! তাঁর ওপর আমাদের প্রতিদিনের প্রার্থনায় আমরা যা বলে থাকি, তার কেন্দ্রে রয়েছে শান্তি, দয়া, প্রেম ও মমতা। তবুও আমরা যা কিছু শেখাই, যা কিছু বলি, সেখানে প্রায়শই শান্তির প্রবাহ বিঘ্নিত হয়। কাজেই আমরা যতই শান্তির প্রদর্শনী থেকে বিমুখ থাকব, মানুষের মনে ইসলামের শান্তির বাস্তবতা ততই সন্দেহের উদ্বেক করবে। এমনকী ইসলাম যে কোমলতা, ভালোবাসা ও আন্তরিকতাপূর্ণ শান্তির লালন করে, সে সম্পর্কে আমরা নিজেরাই একসময় সন্দেহগ্রস্ত হয়ে পড়ব।

অথচ ইসলামের প্রথম ও প্রধান বিষয়ই হলো শান্তির প্রবাহ। আমরা আমাদের ভাই ও বোনকে প্রথম যে সম্ভাষণ জানাই, তা হলো— আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আসসালাম— শান্তি। ‘আপনার ওপর শান্তি এবং আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহ বর্ষিত হোক।’ এটাই আমাদের মূল বক্তব্য। কখনো এটি চিন্তাশীলতার সাথে উচ্চারিত হয়, আবার কখনো উচ্চারিত হয় ভ্রাতৃত্ববোধ ও ভালোবাসার বোধ থেকে। নামাজের শেষে সকল ফেরেশতা, মানুষ ও প্রাণিকুলের প্রতি আমরা একই বাক্যাংশ উচ্চারণের মাধ্যমে শান্তি ছড়িয়ে দিই।

আমাদের আকাঙ্ক্ষাগুলোর লক্ষ্য কী? এই জীবনের পরবর্তী জীবনে আমরা কীসের আশা করি? আমরা সবাই মূলত বেহেশত কামনা করি, যাকে ওহিতে বিভিন্ন নামে অভিহিত করা হয়েছে। তার মধ্যে একটি নাম ‘জান্নাত’ এবং আরেকটি নাম ‘দার আস-সালাম’—শান্তির আবাস।

وَاللّٰهُ يَدْعُوْا۟ اِلٰى دَارِ السَّلَامِ-

‘আর আল্লাহ শান্তির আবাসের দিকে আহ্বান করেন।’ সূরা ইউনুস : ২৫

যেখানে আল্লাহ আমাদের শান্তির আবাসের দিকে আহ্বান করেন, সেখানে এটি কি সঠিক নয়, আমাদের শিক্ষার ভিত্তি নির্মিত হয়েছে আত্মিক ও সামাজিক শান্তির সন্ধানের ওপর? এই শান্তির প্রবাহ কেবল মুসলিমদের ওপর নয়; বরং সকল মানুষ এমনকী পশু-পাখি ও পরিবেশের ওপর প্রয়োগ করাই মুসলিমের কাজ।

وَلَا تُجَادِلُوْا اَهْلَ الْكِتٰبِ اِلَّا بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ اِلَّا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْهُمْ-

‘উত্তম পস্থা ছাড়া কিতাবধারীদের সাথে তর্ক-বিতর্ক করো না, তবে তাদের মধ্যে যারা বাড়াবাড়ি করে তারা বাদে।’ সূরা আনকাবুত : ৪৬

فَقُوْلَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهٗ يَتَذَكَّرُ اَوْ يَخْشٰى-

‘তার সাথে নম্রভাবে কথা বলো, হয়তো সে উপদেশ গ্রহণ করবে কিংবা (আল্লাহর) ভয় করবে।’
সূরা ত্ব-হা : ৪৪

প্রতিরোধের পাঁচ শর্ত

যুদ্ধ আমাদের সকলের কাছে ঘণিত। আমরা সবাই ভেতর থেকে যুদ্ধকে প্রত্যাখ্যান করি, কিন্তু কোনো কোনো সময় মানুষ নিরুপায় হয়ে যুদ্ধের পথ বেছে নেয়। পবিত্র কুরআনে মানুষের এ প্রবণতার কথা উল্লেখিত হয়েছে। ওহিতে মানুষের মনের যৌক্তিক প্রবণতাকে ছাপিয়ে স্পষ্টভাবে বক্তব্য তুলে ধরা হয়েছে—

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا
شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ-

‘তোমাদের জন্য যুদ্ধের বিধান দেওয়া হলো; যদিও এটি তোমাদের কাছে অপছন্দ। আর তোমরা যা পছন্দ করো না, সম্ভবত তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর এবং তোমরা যা পছন্দ করো, সম্ভবত তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। আল্লাহ জানেন, তোমরা জানো না।’ সূরা বাকারা : ২১৬
ওহি আমাদের স্পষ্ট ঘোষণা দেয়—অন্তরের অন্তস্তল থেকে অন্যদের ভালোবাসো, কিন্তু তোমার বুদ্ধিমত্তা প্রয়োগ করো এবং অন্যদের ব্যাপারে সতর্ক থাকো। খেয়াল রাখো—মানুষ কী হতে পারে। কারণ, যারা আল্লাহকে ও সুবিচারকে ভুলে যায়, তারা মূলত নিজেদেরই ভুলে যায়। আর যারা নিজেদের ভুলে যায়, তারা নিজের স্বার্থে, টাকা ও ক্ষমতার স্বার্থে অপরকে হত্যা ও ধ্বংস করতে পারে; সে তার কাজকে যে ছদ্মবেশেই সাজাক না কেন। আমরা প্রতিদিন এ বাস্তবতা প্রত্যক্ষ করি।

মুসলিম হিসেবে অবশ্যই উপলব্ধি করতে হবে, আমাদের বাস্তবতাকে আমলে নিতে বলা হয়েছে। অবশ্যই আপন প্রকৃতিকে বুঝে নিতে হবে এবং যা কিছু আমাদের প্রভাবিত করে, তাকেও ভালোভাবে বুঝতে হবে; চাই সে সুন্দর হোক বা না হোক। আমাদের অবশ্যই শান্তির সন্ধান চালিয়ে যেতে হবে, কিন্তু একই সঙ্গে অন্যায় ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। এই দৃষ্টিতে প্রতিরোধের দায়িত্ব ইসলামে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। লক্ষ্য করুন, আমরা বলছি ‘প্রতিরোধ’; ‘জবরদস্তি’ বা ‘বিরোধিতা’ নয়।

আল্লাহ যদি চাইতেন, তাহলে তিনি আমাদের সবাইকে একই ধর্মের মানুষ হিসেবে পৃথিবীতে পাঠাতে পারতেন। ‘অপর’-এর উপস্থিতিতে মানুষ কী দৃষ্টিতে দেখে—তা আল্লাহ জানেন। তাই তিনি মানুষের পথের ভিন্নতার বিষয়টি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে মনে করিয়ে দিয়েছেন—

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ-

‘তোমার প্রতিপালক ইচ্ছা করলে দুনিয়ার সমস্ত লোক অবশ্যই ঈমান আনত, তাহলে কি তুমি ঈমান আনার জন্য মানুষদের ওপর জবরদস্তি করবে?’ সূরা ইউনুস : ৯৯

মানুষের বিচার কখনো শতভাগ ঠিকমুত্ত হয় না। সমগ্র দুনিয়ার বিচারালয়গুলোর দরজায় দাঁড়িপাল্লার ছবির উপস্থিতি ন্যায়বিচারের সন্ধানের প্রতীক বহন করে। মহানবি মুহাম্মাদ ﷺ নিজেও বিচার করতে গিয়ে সব সময় মানুষকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, তিনি একজন মানুষ এবং তিনিও ভুল করতে পারেন। আমরা সবাই সর্বোচ্চ ন্যায়বিচারের সন্ধান করে চলেছি এবং আমাদের অবশ্যই এই প্রচেষ্টায় জীবনের সকল শক্তি ব্যয় করে যেতে হবে।

এ পর্যায়ে খুব প্রয়োজনীয় একটি প্রশ্ন এসে দাঁড়ায়—যদি অবিচার ও সংঘাত মানুষের স্বাভাবিক প্রকৃতি হয়ে থাকে, তাহলে এগুলোকে নিয়ন্ত্রণের মানদণ্ড কী হতে পারে? সোজা কথায়, কী কী শর্ত উপস্থিত থাকলে যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে পড়ে এবং সে যুদ্ধকে বৈধতা দেওয়া যেতে পারে? যেহেতু ইসলামে কিছু শর্ত রয়েছে, সেহেতু আমরা যেকোনো উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য যুদ্ধ শুরু করতে পারি না। আবার এমন কিছু কারণ আছে, যার কেবল একটির উপস্থিতি যুদ্ধের সকল বৈধতাকে মোচন করে দেয়। হিজরি দ্বিতীয় শতাব্দী থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত মুসলিম স্কলাররা (উলামা) এই বিষয়ে অসংখ্য লেখা লিখেছেন। মুসলিম স্কলারদের উপস্থাপিত সেই কাজগুলো থেকে আমরা যুদ্ধ ও জিহাদের বৈধতার জন্য পাঁচটি শর্ত খুঁজে পাই।

প্রতিরোধব্যবস্থা হিসেবে যুদ্ধ

আবু বকর রাঃ ও অন্যান্য সাহাবিদের বক্তব্য অনুযায়ী, যুদ্ধসংক্রান্ত প্রথম আয়াত অবতীর্ণ হয় হিজরতের দ্বিতীয় বছরে। এ আয়াতটি গভীরভাবে নির্দেশনামূলক। মক্কায় মুসলিমরা যে নিপীড়নের যুগ অতিক্রম করছিল, সে সময় যুদ্ধ তাদের জন্য প্রাসঙ্গিক ছিল না; বরং প্রাসঙ্গিক ছিল অগ্নিপরীক্ষার সামনে ধৈর্য, ধর্মীয় বিশ্বাসকে (ঈমান) দৃঢ়করণ, আল্লাহভীতি অবলম্বন (তাকওয়া), ব্যক্তিগত উন্নয়ন প্রচেষ্টা (জিহাদ আন-নফস) ও অধ্যবসায়। মুসলিমরা মদিনায় স্থায়ীভাবে বসবাস শুরুর পর নিচের নির্দেশ লাভ করলেন—

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلَمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ-

‘যুদ্ধের অনুমতি দেওয়া হলো তাঁদের, যারা আক্রান্ত হয়েছে। কারণ, তাঁরা অত্যাচারিত। আর আল্লাহ নিশ্চয়ই তাঁদের সাহায্য করতে সক্ষম।’ সূরা হজ : ৩৯

সামাজিক জিহাদ

আমরা শান্তি ও যুদ্ধ সম্পর্কে একটা সংক্ষিপ্ত ও পরিষ্কার ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করেছি—যা ছিল প্রকৃতপক্ষে ‘জিহাদ’-এর কেন্দ্রীয় ধারণা। আমরা যে বিষয়ের ওপর জোর দিয়েছি, তা হলো—ন্যায়বিচার ছাড়া শান্তি অসম্ভব। আমরা আজ দুনিয়ার দিকে তাকালে দেখতে পাব, সম্ভাব্য যুদ্ধের জন্ম হয় অন্যায়-অবিচারের আঁতুড়ঘরে। আমরা বলেছি—সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয় পর্যায়ক্রমে, একটু একটু করে। এজন্য আজ আমাদের যা প্রয়োজন তা হলো—সামাজিক জিহাদ।

জিহাদের বহুমুখী কার্যক্রম

মুসলিমদের সবাইকে জানতে হবে নামাজ, জাকাত, রোজা ও হজ পালনের মাধ্যমেই ইসলামের অনুশীলন বন্ধ হয় না। আমাদের দৈনন্দিন জীবনের প্রতিটি কাজ—যা আন্তরিকতার সাথে খোদায়ি বিধানের আলোকে পরিচালিত, সেগুলো ইবাদত হিসেবে গণ্য। পবিত্র কুরআন অধ্যয়ন করলে দেখা যায়, বিশ্বাস (ঈমান) ও কর্মের (আমল) মধ্যে একটি দৃঢ় যোগসূত্র রয়েছে। কুরআনে বারবার বলা হয়েছে—

‘যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে।’ কাজেই সাক্ষ্য দেওয়ার অর্থ হলো বিশ্বাস করা এবং বিশ্বাসকে কাজে পরিণত করা। এখানে কাজের প্রকৃতি হবে বহুমাত্রিক। আমাদের সততার নীতি অবলম্বন করতে হবে, আত্মীয়স্বজনদের সাথে দয়াদ্রু ও কোমল আচরণ করতে হবে, সামাজিক সংস্কার ও অন্যায়ের প্রতিবাদ-প্রতিরোধে আত্মনিয়োগ করতে হবে। এসব কাজ এক দৃষ্টিতে জিহাদের অন্তর্ভুক্ত। কেননা, এ কাজগুলোর মাধ্যমে মানুষ আরও ন্যায়ানুগ সমাজ বিনির্মাণের পথে এগিয়ে যায়, যেখানে একে অপরের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার ফলুধারা বিকশিত হয়। আল্লাহ তায়ালা বলেন—

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّدِيقُونَ-

‘মুমিন তারাই, যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ওপর ঈমান আনে, অতঃপর কোনোরূপ সন্দেহ করে না, আর তাদের জান ও মাল দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করে; তারাই সত্যবাদী।’ সূরা হুজুরাত : ১৫

যারা কেবল আক্ষরিক অর্থকে বুঝতে চান, তারা হয়তো এ আয়াত থেকে এটাই বুঝবে যে, শত্রুদের আক্রমণের বিপরীতে সশস্ত্র জিহাদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে—যা মুমিনদের জন্য অবশ্য কর্তব্য; যেমনটি আমরা আগে উল্লেখ করেছি। ওহি অবতীর্ণের প্রেক্ষাপটও এ ধারণাকে সমর্থন করে। কিন্তু এটি থেকে সরলীকৃত শিক্ষাগ্রহণ করা ঠিক হবে না। বৃহৎ দৃষ্টিতে, কুরআনের সামগ্রিক বক্তব্য এবং হাদিসের শিক্ষা অনুযায়ী ‘আল্লাহর পথে সংগ্রাম’ মানে হলো— অন্যায়, দারিদ্র্য, নিরক্ষরতা, অপরাধ, বহিষ্কার ইত্যাদির শত্রুতাকে চিরতরে মিটিয়ে দিতে সকল মানবীয় শক্তির সমাবেশ, সকল কর্মপ্রচেষ্টাকে নিয়োজিত করা এবং নিজের সহায়-সম্পদ ও জীবন উৎসর্গ করা।

পবিত্র কুরআন অবতীর্ণের শুরুর দিকে জিহাদের এমন ব্যাখ্যাই দেওয়া হয়েছে—

فَلَا تُطِيعُ الْكُفْرَيْنَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا-

‘কাজেই তুমি কাফিরদের আনুগত্য করো না; আর কুরআনের সাহায্যে তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করো; কঠোর সংগ্রাম।’ সূরা ফুরকান : ৫২

এখানে সংগ্রামের ব্যাখ্যা তুলে ধরা হয়েছে। জাহিদ ও জিহাদুন হলো সংলাপ, আলোচনা ও বিতর্কের একটি বুদ্ধিবৃত্তিক ও বিজ্ঞানসম্মত ধারা। বলা হয়েছে—জিহাদের একটি হাতিয়ার হলো কুরআনের গঠন ও এর বক্তব্য। অন্যদিকে রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন জিহাদের বিস্তারিত ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেছেন, উদাহরণস্বরূপ তিনি বলেছেন—হজ একটি জিহাদ। তেরো বছর ধরে মক্কায় নিপীড়ন সহ্য করা ও জুলুম বন্ধের চেষ্টার পর যখন আল্লাহর নির্দেশনা এলো, তখনই সেটা ‘আল্লাহর পথে জিহাদ’-এ রূপলাভ করল।

আধুনিক যুগের চ্যালেঞ্জ

বর্তমান সমাজে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে নিষ্ঠার সাথে ধর্ম পালন করা একপ্রকার জিহাদ। আমাদের ঈমানের পরীক্ষা নেওয়া হয়, ঈমান স্বয়ং একটি পরীক্ষা। আদর্শ জীবন গড়তে পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা ও সহাবস্থানের চেষ্টা করা, সামাজিক বিভাজন, বৈষম্য, নিরক্ষরতা, বেকারত্ব ইত্যাদির নিরসনে বিদেষ কমিয়ে শান্তি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা জিহাদেরই অংশ।

যখন মানুষের মর্যাদা সংকটাপন্ন, তখন প্রয়োজন হয় একতার; যেমনটি আমরা আগে বলেছি। কিন্তু তার অর্থ এই নয়, সব সময় অস্ত্রের ব্যবহার করতে হবে। আজ দুনিয়াজুড়ে বহু মানুষের মানবীয় মর্যাদা ভুলুপ্তিত, বহু লোকের জীবন ও সম্পদের অস্তিত্ব হুমকির মুখে, বহু মানুষের অধিকার লঙ্ঘিত; যে পরিস্থিতিগুলোর দাবি হলো—জরুরি ভিত্তিতে জিহাদের ডাক। এটি হলো নিজেকে ও নিজের সম্পদকে উৎসর্গ করার প্রশ্ন। সমাজের সব শক্তিকে একত্রিত করে সামাজিক সংস্কারের উদ্যোগ নেওয়ার প্রশ্ন।